উচ্চশিক্ষার গতি, গন্তব্য ও শিক্ষা সংস্কার কমিশন

ফাইল ছবি

আবদুল কাইয়ুম মাসুদ ও শেখ নাহিদ নিয়াজি

প্রকাশ: ২৭ নভেম্বর ২০২৪ | ০০:০৮

- অ +

খুব কম দেশই খুঁজে পাওয়া যাবে যেখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শিক্ষার কার্যকরী সমন্বয় নেই; নীতির কার্যকরী বাস্তবায়ন নেই। কিন্তু বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার জন্য কার্যকরী কৌশল যেমন নেই, তেমনি তার যুগোপযোগী বা কার্যকরী ব্যবস্থাপনাও নেই। এই যে কৌশল ও নীতির সঙ্গে কার্যকরী প্রয়োগের অভাব, সেটি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাপনার বড় দুর্বলতা।

দেশে এখন সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে ১৬৬টি বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা থেকে সেমিস্টার

মেয়াদ অথবা ডিগ্রি প্রদান ভিন্ন। একই সময়ে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থী ভিন্ন ভিন্ন মেয়াদের ডিগ্রি পাচ্ছে। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনজট নেই। অনেকেই সেশনজটের নামে জীবন থেকে দু'তিন বছর হারিয়ে ফেলছে। সমস্যাটি শুধু এক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অন্যটির নয়; একই বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিভাগের থেকে অন্য বিভাগেরও পার্থক্য বিরাজমান। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবছর সমাবর্তন করছে। কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ১০ বছরে একবারও করছে না।
একই সময়ে এইচএসসি পাস করা একজন শিক্ষার্থী যখন চাকরির বাজারে অন্য শিক্ষার্থীর থেকে দু'তিন বছর আগে বা পরে প্রবেশ করে, সেখানে বড় বৈষম্য তৈরি হয়।

এসব সমন্বয়হীনতা সহজেই সমাধান করা যেতে পারে অভিন্ন সময় নির্ধারণের মাধ্যমে। সবার জন্য নির্দিষ্ট একটি সময়ের মধ্যে সব বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কার্যক্রম শেষ ও ক্লাস শুরু করবে। নির্ধারিত একটি সময়েই সবাইকে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ করতে হবে। নির্দিষ্ট টাইমফ্রেমের মধ্যে দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাজ শেষ করলে সেশনজটের নামে জীবন থেকে দু'তিন বছর হারিয়ে যাবে না। উচ্চশিক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউজিসির কাজটি করার কথা থাকলেও দুঃখজনকভাবে এমন চিন্তার প্রতিফলন দেখা যায়নি।
বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল কাজ নতুন জ্ঞান তৈরি ও বিতরণ। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে হতে হয় গবেষণাবান্ধব। কিন্তু লজ্জার বিষয়, বাংলাদেশের বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশই নেই। গবেষণাকেন্দ্রিক আকাঙ্ক্ষাও নেই। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক কর্মপরিকল্পনা পর্যন্ত নেই; ডিগ্রি প্রদান করাই তাদের মূল কাজ। ডিগ্রি কতটা মানসম্মত হলো; শিক্ষার্থীরা কতটুকু যোগ্যতা অর্জন করতে পারল; ডিগ্রি দিয়ে শিক্ষার্থী নিজেকে কতটুকু গড়ে তুলতে পারবে; সেই ডিগ্রি বৈশ্বিক বাজারে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারবে কিনা; সেগুলোর মান পরিমাপের পদ্ধতি আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই। এগুলো কি সংস্কারের প্রয়োজন নেই?

বাংলাদেশে বিভিন্ন রকমের বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে: সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু এগুলোর পার্থক্য শুধু নামেই; একাডেমিক দিক থেকে খুব একটা নয়। সাধারণ

বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ধরনের সাবজেক্ট পাবেন; বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়েও তা পাওয়া যাবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সাবজেক্ট, সেটা ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়েও পাবেন। আবার কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সাবজেক্ট পাওয়া যাবে সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়েও। তাহলে নামকরণে ভিন্নতার দরকারটা কোথায়?

বিশ্ববিদ্যালয় হলেই কি যে কোনো সাবজেক্ট খুলে ফেলা যায়? এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কোনো সাবজেক্ট খোলা; যে কোনো ডিগ্রি দেওয়া; এ জন্য কোনো পলিসি আছে? বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো বিভিন্ন সাবজেক্টের শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ কতখানি; গবেষণার সুযোগ কতটুকু; এগুলো কেউই চিন্তা করছে না। বিশ্ববিদ্যালয় যেহেতু হয়েছে; সাবজেক্ট খুলতে হবে; শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে; বাণিজ্য করতে হবে; রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে হবে। এগুলোর কি সংস্কার দরকার নেই?

বাংলাদেশের কয়টি ইনস্টিটিউটে বিশ্বমানের গবেষণা ও গবেষক তৈরি হয়? কয়টি ইনস্টিটিউটে বিদেশি গবেষকরা আসেন কিংবা সেখানে নিজেদের প্রয়োজনমতো টেকনোলজি তৈরি হয়? এই দেশের অনেক শিক্ষক ও গবেষক বিদেশের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে আসছেন। তাহলে আমরা কেন বিশ্বমানের গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরি করতে পারিনি, যেখান থেকে স্থানীয় সমস্যা সমাধানে টেকনোলজি তৈরি হবে? এগুলোর জন্য কি শিক্ষা খাতে সংস্কারের প্রয়োজন নেই? আমরা কি একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করতে পারি না, যেখান থেকে মৌলিক শুধু নয়, প্রায়োগিক সমস্যারও সমাধান হবে? সেখানে কর্মরত বিজ্ঞানীরা নোবেল পুরস্কার পাওয়ার দৌড়ে এগিয়ে থাকবেন!

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে নীতিনির্ধারক কারা? সহজভাবে বললে, এখানে ভাইস চ্যান্সেলর সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি নিজের মতো নিয়োগ বোর্ড গঠন, সিন্ডিকেট তৈরি ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করবেন। অন্যদের হয় তাঁকে সহযোগিতা করতে হবে, না হয় তাঁর বিরোধিতা করতে হবে। চুপচাপ নিজের কাজ চালিয়ে যাওয়া যাবে না। এখানে কি সংস্কারের দরকার নেই?

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কারা ভাইস চ্যান্সেলর হচ্ছেন? নিয়োগের প্রক্রিয়া কী? এখানে অত্যন্ত অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় উপাচার্য নিয়োগ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে নিয়ন্ত্রক সংস্থা ইউজিসি, সেখানেও অস্বচ্ছ প্রক্রিয়াতেই সদস্য ও চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হয়। এসব নিয়োগের স্বচ্ছ নিয়ম থাকা উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইউজিসি– শিক্ষা, গবেষণা, যোগ্যতা দিয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই নীতিনির্ধারক নিয়োগ জরুরি।

আমরা বারবার বলছি, 'কোয়ালিটি এডুকেশন' নিশ্চিত করতে হবে। এ জন্য যে বিনিয়োগ দরকার, সেটা কি আমরা করছি? জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করে ফেলছি। আদৌ কি সেগুলো বিশ্ববিদ্যালয় হতে পেরেছে? অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র চার-পাঁচজন শিক্ষক মিলে অনার্স-মাস্টার্স ডিগ্রি দিয়ে দিচ্ছেন। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত ভবন, শিক্ষকদের বসার জায়গা ও ল্যাবরেটরি নেই। শিক্ষার্থীদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। এগুলোর কি সংস্কার দরকার নেই?

শিক্ষায় বিনিয়োগ না বাড়ালে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন কখনোই সম্ভব নয়।

জিডিপির ৫ ভাগেরও বেশি শিক্ষায় বিনিয়োগ করতে হবে। জেলায় জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় না করে যেসব বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, সেগুলোর সক্ষমতা ও কোয়ালিটি এডুকেশন নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় সামনে আমাদের আরও অন্ধকার পথ।

কারা শিক্ষক হবেন, সে ব্যাপারে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের লিখিত নিয়ম আছে। কিন্তু যে কোনো সময় কর্তৃপক্ষ চাইলে নিয়মগুলো শিথিল করে ফেলতে পারে। পছন্দের প্রার্থীকে নিয়োগ দিতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বলে দেওয়া হয়: 'শর্ত শিথিলযোগ্য'। শর্তের এমন শিথিলযোগ্যতা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এখনও অনেক শিক্ষক রয়েছেন, যাদের সর্বশেষ ডিগ্রি মাস্টার্স। মাস্টার্সের ছাত্রকে ডিগ্রিও দিচ্ছেন। অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স পাস অধ্যাপক পাওয়া যাবে, যিনি পিএইচডি প্রোগ্রামের সুপারভাইজার। উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে চলছে এমন হযবরল!

এ দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বেশির ভাগ শিক্ষককে চিন্তা করতে হয়, মাসের শেষ ১০ দিন কীভাবে কাটবে! বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রভাষক যে বেতন পান, সেটা দিয়ে ঢাকার বাইরে চললেও ঢাকায় বাড়ি ভাড়া দিতে হিমশিম খেতে হয়। সেই শিক্ষক কীভাবে শিক্ষা-গবেষণায় মনোযোগ দেবেন?

শিক্ষক ঠকিয়ে কোনো জাতি কখনও উন্নতি করতে পারে না। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত বিনিয়োগ ছাড়া উন্নত বাংলাদেশ গড়ার চিন্তা বাতুলতা মাত্র। প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সরকারকে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ করতে হবে। কোয়ালিটি এডুকেশন নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষা খাতে কোয়ালিটি বিনিয়োগ করতেই হবে। অন্যথায় শিক্ষকতা পেশায় কোয়ালিটি মানুষ আসবে কেন?

উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণী সংস্থা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) নিয়েও নতুন করে ভাবতে হবে। সময় এসেছে সংস্থাটিকে নিয়ে কথা বলার; সংস্কার করার। ইউজিসি এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষার একক গাইডলাইন তৈরি করতে পারেনি। পারেনি তাদের জন্য বার্ষিক ক্যালেন্ডার তৈরি করতে। শিক্ষক নিয়োগ থেকে পদোন্নতি

বিষয়ে সামগ্রিক ও যুগোপযোগী নীতিমালা কি রয়েছে? ইউজিসির সংস্কার ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইতিবাচক পরিবর্তন কীভাবে সম্ভব?

এখনও সময় শেষ হয়ে যায়নি। দেশের ভেতরে-বাইরে অনেক দক্ষ-যোগ্য একাডেমিশিয়ান, গবেষক রয়েছেন, যারা উচ্চশিক্ষায় ভূমিকা রাখতে সক্ষম ও সম্মত। তাদের সমন্বয়ে একটি 'উচ্চশিক্ষা কমিশন' গঠন করা যেতে পারে। এ সরকার অচিরেই 'জাতীয় শিক্ষা সংস্কার কমিশন' গঠন করে গণঅভ্যুত্থান-উত্তর বাংলাদেশের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর ইচ্ছা ও দাবি পূরণ করুক।

ড. আবদুল কাইয়ুম মাসুদ: অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; শেখ নাহিদ নিয়াজি, সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ